৫ম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা।
কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪১৫
নভেম্বর ২০০৮
পল্লীতথ্য বুলেটিন একটি ডি.নেট প্রকাশনা।

পল্লীতথ্য

কৃষি ▪ শিক্ষা ▪ স্বাস্থ্য ▪ অ-কৃষি উদ্যোগ ▪ লাগসই প্রযুক্তি ▪ আইন ও মানবাধিকার ▪ সচেতনতা

আমের সুরক্ষা ও বিভিন্ন পোকা দমন পদ্ধতি

- নারী-পুরুষ-এর সমান অধিকার চাই
- আই.এল.টি.এস কেন এবং কিভাবে
- মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ সেলস ক্যারিয়ার
- অফলাইন তথ্যভাণ্ডার

সম্পাদকীয়

সহনশীলতা ও সহমর্মিতাবোধ জাগ্রত হোক

সহনশীলতা মনুষত্বের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এ গুণাবলী মানুষকে অপরাপর জীব থেকে আলাদা করেছে। সহনশীলতা মানুষকে দলবদ্ধভাবে বসবাস করে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে মানুষের উন্নয়নে অবদান রেখে চলছে। ১৯৯৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় এ দিবস পালনের ঘোষণা দেয়া হয়। সহনশীলতা মানে হাচ্ছে সম্মান প্রদর্শন, গ্রহণযোগ্যতা এবং উপলব্ধিবোধ যার মাধ্যমে একটি বৈচিত্র্যময় সমৃদ্ধ জাতির সংস্কৃতি, তার জনগণের মানবিক গুণাবলী প্রকাশ পায়। এ দিবস পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা, অসহনশীলতার ভয়াবহতা সম্পর্কে জানানো এবং পাশাপাশি সহনশীলতা বাড়ানো এবং এ সম্পর্কে শিক্ষা দেয়।

১৯৫৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভার ঘোষণা অনুযায়ী সার্বজনীন শিশু দিবস পালন হয়ে আসছে। সাধারণত ২০ নভেম্বর এ দিবসটি পালিত হয়। শিশুদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সমঝোতাবোধ জাগ্রত করা এবং পৃথিবীর সকল শিশুর কল্যাণে কাজ করার অভিপ্রায়ে এ দিবসটি পালিত হয়। আমাদের দেশের শিশুরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। কখনো কখনো আমাদের সহানুভূতি প্রত্যাশা করেও পায় না। তাই সরকার বা কারো দায়িত্বের দিকে না তাকিয়ে আমাদের সকলেরই উচিৎ তাদের অপরিহার্য প্রয়োজন মেটাতে ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সহযোগিতা করা। মনে রাখতে হবে, সকল শিশুর ভবিষৎ নিশ্চিত করা না গেলে আমাদের পরবর্তি প্রজন্মকেও এর বোঝা বহন করতে হবে।

সুস্থ ও সুন্দর দেশ ও জাতি উপহার দিতে দিবস দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সকলেরই উচিতৎ, সকলের প্রতি সহনশীলতার দৃষ্টিতে সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া এবং শিশুদের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা, যা তাদের সুন্দর বিকাশে সহায়ক হয়।

তথ্যবহুল এ সংখ্যায় রয়েছে আমাদের প্রিয় মজাদার আম নিয়ে বিস্তারিত তথ্য। এর রক্ষণাবেক্ষণ চাষাবাদ ও উৎপাদন নিয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন, যা আপনার বা প্রতিবেশীর আম রক্ষণাবেক্ষণে আপনার অগ্রগণ্য ভূমিকা অবদান রাখবে। এছাড়াও থাকছে আইইএলটিএস সম্পর্কে বিস্তারিত প্রয়োজনীয় তথ্য যা আপনার ইংরেজি শেখা বা আইএলটিএস সনদ সম্পর্কে ধারণা দিবে। নিয়মিত বিভাগসহ এ সংখ্যাটি আপনাদের বিশেষ উপকারে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সূচি

- আমের সুরক্ষা
- নারী-পুরুষ-এর সমান অধিকার চাই: নারী-পুরুষের সমঅংশগ্রহণ ও সমঅধিকার নিশ্চিত করার জন্যে কিছু প্রস্তাব
- আই.এল.টি.এস কেন এবং কিভাবে
- অফলাইন তথ্যভাণ্ডার
- তথ্য ও প্রযুক্তি
- মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ সেলস ক্যারিয়ার

সম্পাদক
মাহমুদ হাসান

নির্বাহী সম্পাদক
খায়রুল হাসান

সহকারী সম্পাদক
ইখতিয়ার হাসান

অনলাইন ব্যবস্থাপক
মাইনুল ইসলাম
এস.এইচ.এম. আরাফাত

লেখক
সাইফুল ইসলাম, আসমা আইয়ুব বেবী
জয়ন্তী রানী দাস, মেহেরুন নেসা
সেলিনা সুলতানা, ইখতিয়ার হাসান

বিপণন ও বিতরণ
আফরোজা মেরিন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সবুজ ভাস্কর

ছবি: ইখতিয়ার হাসান, ডি.নেট ও ইন্টারনেট থেকে সংগৃহিত।

আমের সুরক্ষা

স্বাদে, পুষ্টিতে ও গন্ধে আম অতুলনীয়। তাই আমকে ফলের রাজা বলা হয়। বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই আম উৎপাদন করা হয়। তবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, মেহেরেপুর জেলাগুলোতে উৎকৃষ্টমানের আম উৎপাদন হয়। গভীর, সুনিষ্কাশিত , উর্বর দোআশ মাটি আম চাষের জন্য উত্তম।

মধু মাস আসতে আর দেরি নেই। এ সময় যদি আম গাছের পোকা ও রোগ সঠিকভাবে প্রতিরোধ ও দমন না করা যায় তাহলে মধু মাস এলেও আম পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। আর সে কারণেই আমগাছের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়ার এখনই সময়।

আমের হপার

আম উৎপাদনে সবচেয়ে ক্ষতিকারক পোকা এটি। তিনটি প্রজাতির হপার আমাদের দেশে আমের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। সারা বছরই আমগাছে এ পোকাগুলো দেখা যায়। আমগাছের নিচে গেলে পোকাগুলোর স্পর্শ আমরা চোখ, মুখ ও শরীরে অনুভব করা যায়। পূর্ণবয়স্ক হপারগুলো দেখতে সবুজ-বাদামি রঙের তিনকোনা খিলের মতো ও লম্বায় ৩ দশমিক ৪ মিমি থেকে ৫ দশমিক ৩ মিমি পর্যন্ত হয়।

দমন: আমগাছে মুকুল আসার ১০ দিনের মধ্যে একবার এবং এর এক মাস পর আরেকবার প্রতি লিটার পানির সঙ্গে ১ দশমিক শূন্য মিলি সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড, সিমবুস, ফেনম, অন্য নামের) ১০ ইসি মিশিয়ে আমগাছের কাণ্ড, ডাল, পাতা ও মুকুল ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। আমের মুকুল ও পাতার সুটিমোল্ড দমনের জন্য টিল্ট ২৫০ ইসি (প্রতি লিটার পানির জন্য শুন্য দশমিক ৫ মিলি হারে) আমের হপার দমনে কার্যকরী কীটনাশকের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ভোমরা পোকা

পূর্ণবয়স্ক একটি ভোমরা পোকা ৫ থেকে ৭ মিমি লম্বা, গাঢ় বাদামি রঙের শক্ত পাখাযুক্ত এবং মাথায় শুঁড়যুক্ত মুখ থাকে। স্ত্রী পোকা মার্চ-এপ্রিল মাসে কাঁচা আমের গায়ে মুখের শুঁড়ের সাহায্যে চিরে তার মধ্যে ডিম পাড়ে। আমের গায়ের ক্ষতচিহ্ন আস্তে আস্তে মুছে যায়। আক্রান্ত আমের খোসার নিচে ডিম পাড়ার সাত দিনের মধ্যে ডিম ফুটে পাবিহীন কিড়া বের হয় এবং কিড়াগুলো ফলের শাঁসের মধ্যে আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ তৈরি করে খেতে থাকে। আক্রান্ত ফল কাটলে শাঁসে পোকার কিড়ার তৈরি আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ, সুড়ঙ্গে পোকার কিড়া দ্বারা নির্গত কালো রঙের মল এবং পোকার কিড়া বা পুত্তলি বা পূর্ণবয়স্ক পোকা (উইভিল) দেখা যায়। আমের মৌসুম শেষ হওয়ার পর উইভিল আমগাছের নিচে মাটির ভেতরে, গাছের কাণ্ড ও ডালের শুকনো বাকলের নিচে এবং আমগাছে জন্মানো বিভিন্ন পরগাছা দ্বারা সৃষ্ট জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

দমন: উন্নত কলমের উইভিলের আক্রমণ কম হয়, তাই এরূপ উন্নত জাতের কলমের আমগাছ লাগাতে হবে। আক্রান্ত আম পেড়ে এবং গাছের নিচে পড়ে থাকা এরূপ আম কুড়িয়ে নিয়ে মাটিতে গর্ত করে (১ দশমিক ৫ থেকে ২ ফুট গভীর) পুঁতে রাখতে হবে। তা ছাড়া জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি প্রতিটি আমগাছের চারদিকে চার মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তের মধ্যে সব আগাছা পরিষ্কার করে ভালোভাবে মাটি কুপিয়ে ওলট-পালট করে দিতে হবে, যাতে মাটির ভেতর লুকিয়ে থাকা উইভিলগুলো ধ্বংস হয়।

আম সংগ্রহের পর গাছের সব পরগাছা ও পরজীবী উদ্ভিদ ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করে আমের উইভিল দমন করার জন্য মার্চ-এপ্রিল মাসে যখন আমের আঁটি শক্ত হতে শুরু করে সে সময় থেকে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে সুমিথিয়ন ৫০ ইসি বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি বা লিবাসিড ৫০ ইসি মিশিয়ে আমগাছের কাণ্ড, ডাল, পাতা ও আম ভালোভাবে ভিজিয়ে ১৫ দিন অন্তর একাধিকবার স্প্রে করতে হবে।

অ্যাপছিলা পোকা

দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অ্যাপছিলা পোকার আক্রমণ সর্বাধিক হয়ে থাকে। এ পোকার আক্রমণের ফলে গাছে নতুন পাতা ও ফুলের কুঁড়ির বদলে সবুজ রঙের ছোট মোচাকৃতির গলের সৃষ্টি হয়। এ গলগুলো থেকে কোনো পাতা বা ফুল বের হয় না। আক্রান্ত গাছে আমের ফলন খুব কম হয়। স্ত্রী পোকা মার্চ-এপ্রিল মাসে কচি পাতার নিচের পিঠের মধ্য শিরায় ডিম পাড়ে। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে আক্রান্ত স্থান হতে মধুরস ও মোমের গুঁড়ার মতো পদার্থ বের হতে দেখা যাবে। এ সময় আক্রান্ত পাতার পালগুলোয় অনেক গল সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

দমন: আক্রান্ত আমগাছে সৃষ্ট গলসমূহ এবং আক্রান্ত পাতাগুলো সংগ্রহ করে পুড়ে ফেলতে হবে। এজন্য আমগাছে অ্যাপছিলা পোকার আক্রমণ হয়েছে কি না তা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। রাসায়নিক পদ্ধতিতে অ্যাপছিলা পোকা দমনের দুটি পদ্ধতি রয়েছে-

ইনজেকশন: এ পদ্ধতিতে আক্রান্ত আমগাছের প্রধান শাখাগুলোর প্রত্যেকটিকে একটি করে ২ থেকে ৩ সেমি গভীর ছিদ্র করে নিতে হবে। প্রতিটি ছিদ্রের মধ্যে ইনজেকশন সিরিঞ্জের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিমাণে (৫ থেকে ১০ মিলি) ডাইমিথোয়েট (রক্সিন, পারফেকথিয়ন) বা মনোক্রোটোফস (এজোড্রিন, নুভাক্রন) দিয়ে ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। স্প্রেঃ আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে যখন আক্রান্ত স্থান দিয়ে গুঁড়া বস্তু বা মল বের হয়ে আসে তখন থেকে শুরু করে প্রতি ২০ দিন অন্তর তিন-চারবার ডাইমিথোয়েট ৪০ ইসি বা মনোক্রোটোফস ৪০ ডব্লিউ.এস.পি. প্রতি লিটার পানির জন্য ৩ দশমিক শূন্য মিলি হারে মিশিয়ে গাছের পাতায় ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।

কাণ্ডের মাজরা পোকা

আমগাছের কাণ্ডের মাজরা পোকা আমগাছের কাণ্ড ও শাখাকে আক্রমণ করে। স্ত্রী পোকা গাছের কাণ্ড ও শাখায় গর্ত করে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে পোকার কিড়া বের হয়ে কাণ্ড বা শাখার মধ্যে সুড়ঙ্গ করে ঢোকে। একটি পূর্ণতা প্রাপ্ত কিড়া লম্বায় প্রায় ৮৫ থেকে ৯৫ সেমি হয়ে থাকে।

আক্রান্ত কাণ্ড ও শাখার আক্রমণ স্থান দিয়ে শুকনা ও শক্ত ছোট ছোট বলের মতো পোকার মল নির্গত হয়। ছোট গাছের কাণ্ড আক্রান্ত হলে গাছ মারা যেতে পারে। আক্রান্ত শাখাগুলো সহজেই ভেঙে যায়।

দমন : আক্রান্ত কাণ্ড বা শাখায় সৃষ্ট সুড়ঙ্গ পথে সুচালো লোহার শিক ঢুকিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পোকার কিড়া মারা সম্ভব। আক্রমণের সংখ্যা বেশি হলে কাণ্ড বা শাখায় আক্রমণের সুড়ঙ্গগুলো পরিস্কার করে নিয়ে তার মধ্যে ইনজেকশন সিরিঞ্জের মাধ্যমে কেরোসিন বা নগস ৫ থেকে ১০ মিলি পরিমাণ ঢুকিয়ে কাদা দিয়ে সুড়ঙ্গপথ বন্ধ করে দিতে হবে। এতে পোকার কিড়া বিষাক্ত গ্যাসে মারা যাবে।

তথ্য উৎস: কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর , গাজিপুর, ফলচাষের কলাকৌশল, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামার বাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

নারী-পুরুষ-এর সমান অধিকার চাই

নারী-পুরুষের সমঅংশগ্রহণ ও সমঅধিকার নিশ্চিত করার জন্যে কিছু প্রস্তাব

আমাদের দেশের রাজনীতি প্রবলভাবে পুরুষকেন্দ্রিক। প্রতিকূল পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধার অভাবে নারীরাও রাজনীতির প্রতি কিছুটা আগ্রহহীন। আর্থিক সম্পদের অভাব এবং সাংসারিক কাজের সব দায়-দায়িত্ব ও বোঝা নারীর কাঁধে চেপে থাকায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ কঠিন হয়ে পড়েছে। পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব, প্রচলিত বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি-রাজনীতি থেকে নারীদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। কখনো কখনো ধর্মের দোহাই দিয়েও রাজনীতি থেকে নারীকে দূরে রাখা হয়।

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন পুরনো দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং নতুন চেতনার নির্মাণ। নারীর জীবনে অর্থপূর্ণ পরিবর্তন আনতে হলে আগে দরকার পুরনো, গতানুগতিক ও ক্ষতিকর দৃষ্টিভঙ্গি ভেঙ্গে-চুরে নতুন চেতনা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করা; নারীকে নতুন ভূমিকায় গড়ে তোলার জন্য মানসিকভাবে তৈরি হওয়া। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নারী-পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য কমিয়ে সমঅংশগ্রহণ ও সমঅধিকারভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষে বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট গত ২৭ অক্টোবর ২০০৮ রাজনৈতিক দলের নেতা, শিক্ষক-গবেষক-সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব তুলে ধরেছে। প্রস্তাবগুলো বিবেচিত হলে গণতন্ত্র ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রের সুষ্ঠু পরিচালনা, সুশাসন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে অনেক বাধাই অপসারিত হবে। প্রস্তাবগুলো হলো-

১. সকল রাজনৈতিক দলের ঘোষণাপত্র ও নির্বাচনী ইশতেহারে সমঅংশগ্রহণ ও সমঅধিকারভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার;

- নারীকে রাজনীতির সমঅংশীদার করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলের সকল কমিটিতে কমপক্ষে শতকরা ৩৩ ভাগ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করা;
- জাতীয় সংসদ এক-তৃতীয়াংশ নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা এবং তার জন্য সুনির্দিষ্ট সংসদীয় আসন ও ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারণ করা;
- জাতীয় সংসদের সাধারণ আসনে নারী প্রার্থী বাড়ানোর জন্য দলের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের মধ্যে অন্তত একজন নারী নির্বাচিত করা;
- স্থানীয় সরকারের সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের জন্য নির্বাচনী এলাকা, দায়-দায়িত্ব ও ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করা;
- সংসদের সকল স্ট্যান্ডিং কমিটিতে নারী প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা, সংখ্যানুপাতে স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপ্রধান হিসাবে নারী সদস্য মনোনীত করা;
- সংসদীয় জেন্ডার কমিশন গঠন;
- রাজনৈতিক দলের ঘোষণাপত্র ও নির্বাচনী ইশতেহারে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ সম্পর্কে দলের অবস্থান ঘোষণা করা এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন কীভাবে, কতদিনের মধ্যে করা হবে তা সুনির্দিষ্ট করা;
- সিডও সনদের ধারা ২ ও ১৬-১ (গ) থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে পূর্ণ অনুমোদন ও তা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করা।

২. ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য টিকিয়ে রাখে এ ধরনের আইনের সংস্কার এবং নারীর সমঅধিকার ও সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ আইন প্রণয়ন:

- সম্পত্তিতে নারীর সমঅংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বজনীন পারিবারিক আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করা;
- ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড, সিভিল প্রসিডিউর কোড এবং অ্যাভিডেন্স অ্যাক্টে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ধারাসমূহ শনাক্ত করা এবং সেগুলো দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বৈবাহিক জীবনে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বজনীন ও সমঅধিকারভিত্তিক বিবাহ নিবন্ধন ও বিবাহ বিচ্ছেদ আইন প্রণয়ন করা;
- নারীদের বিরুদ্ধে ফতোয়া বা ধর্মীয় অনুশাসন প্রয়োগ সামাজিক ও আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করা;
- নাগরিকত্ব আইনের সংস্কার করা। কোনো ছেলে বা মেয়ে বিদেশি নাগরিককে বিবাহ করলে বৈবাহিকসূত্রে উক্ত বিদেশি নাগরিক ও তাদের সন্তানের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভের অধিকার বিষয়ে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- অভিভাবক ও পোষ্য আইন ১৮৯০ সংশোধন করে অভিভাবক ও পোষ্য গ্রহণের বিধানে সমতা আনা;
- 'ইকুয়াল অপরচুনিটি অ্যাক্ট' প্রণয়ন করা।

৩. আমাদের দেশে ঘরে-বাইরে নারীর প্রতি সহিংসতা এক ধরনের সামাজিক ব্যাধি হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই ব্যাধি নির্মূল করার জন্য চাই বিশেষ ও কার্যকরী উদ্যোগ:

ক. পারিবারিক পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতা কমানোর জন্য পারিবারিক নির্যাতন-বিরোধী আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ।

খ. নারী নির্যাতন-বিরোধী একটি সম্মিলিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় বাজেটে যথাযথ বরাদ্দ রাখা।

গ. রাস্তাঘাটে উত্যক্তকরণ প্রতিরোধের লক্ষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রেখে কঠোর আইন প্রবর্তন।

ঘ. নারী নির্যাতনের মামলাসমূহ দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ঙ. ধর্ষণ বা অন্য যে কোনো হয়রানি-নির্যাতনের ঘটনা প্রমাণে ক্যামেরা ট্রায়ালের বিধান যুক্ত করে 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০' সংশোধন করা, আত্মপক্ষ সমর্থনে নারীকে নিজের মতামত প্রকাশের সুযোগ দেয়া।

চ. নারীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলার জন্য সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং নারী নির্যাতনকারীদের কোনোক্রমেই রাজনৈতিকভাবে প্রশ্রয় না দেয়া।

৪. আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা নারী-পুরুষের বৈষম্য টিকিয়ে রাখতে ভূমিকা রাখছে। শিশুকাল থেকে ছেলেমেয়েদের শংকামুক্ত আবহে যৌথভাবে বড় হওয়ার অবাধ পরিবেশ তৈরি করার জন্য প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে যথাযথ শিক্ষানীতি এবং সর্বজনীন শিক্ষা কারিকুলামের মাধ্যমে সকল শিক্ষা পরিচালনা করা। এ ছাড়া দক্ষ মানবসম্পদ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ আরো বাড়ানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি বন্ধের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বাধ্য করা।

৫. আমাদের দেশে প্রাথমিক ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা পাবার মতো তেমন কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু প্রতিটি কিশোর-কিশোরীকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য এই শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা একান্ত প্রয়োজন। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই সচেতনতামূলক কাজটির জন্য যাতে ভূমিকা রাখতে পারে তার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, কারিকুলাম তৈরি এবং তা বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত কর্মপরিকল্পনা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ।

৬. কৃষি ও পারিবারিক কাজে নারীর অংশগ্রহণ ও ভূমিকা অনেক। ধান গোলায় তোলা, বীজ সংরক্ষণ করা, খাবারের জন্য শস্য ভাঙানো, হাঁস-মুরগির যত্ন নেওয়া, শাক-সবজি উৎপাদন ইত্যাদি কাজের সঙ্গে নারী সরাসরি সম্পৃক্ত। বাংলাদেশে মোট গ্রামীণ নারীর প্রায় ৭৭ শতাংশ কৃষিতে কাজ করেন। এছাড়া গৃহস্থালি কাজের প্রায় পুরোটাই করতে হয় নারীকে। অথচ অর্থনৈতিকভাবে তাদের কাজের কোনো মূল্যায়ন করা হয় না এবং নেই কোনো স্বীকৃতি। তাই নারীর অধিকার ও মর্যাদার দিক বিবেচনা করে-

- কৃষিকাজে নিয়োজিত নারীদের কৃষক হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া;
- নারীদেরকে দক্ষ কৃষি শ্রমিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও লাগসই প্রযুক্তি সরবরাহ করা।

৭.কৃষিকাজে নারীদের সহজশর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা। নারীকে সস্তা শ্রমের যোগানদাতা হিসাবে নয় বরং যোগ্য নাগরিক ও পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে বিবেচনা করে সকল নীতি ও আইন সংস্কার/প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা। অর্থনীতিতে নারীর ভূমিকা ও অবদানকে স্বীকৃতি দেয়া। নারীকে মূলধারার অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তাদের দক্ষতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ন্যায্য ও সমান কাজে সমান মজুরি নিশ্চিত করা এবং শ্রমজীবী-কর্মজীবী নারীদের জন্য নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র তৈরি করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ। ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া।

৮.জাতীয় উন্নয়নে নারীরা আজ সমঅবদানকারী। তাই সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়ার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া। নারীর অবদানকে টিকিয়ে রাখা এবং বাড়ানোর লক্ষ্যে ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ, সহজশর্তে মূলধন সরবরাহ, আইনের সংস্কার এবং বাজারজাতকরণের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ।

৯. নারী প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমাজ ও পরিবারে বিদ্যমান নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে উন্নয়নের মূলধারায় তাদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, নীতি ও কাঠামোগত পরিবর্তন আনা এবং নীতিসমূহ বাস্তবায়নে যথোপযুক্ত উদ্যোগ এবং জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ রাখা।

১০. জাতীয় অর্থনীতিতে অভিবাসীদের বড় ধরনের অবদান রয়েছে। অভিবাসী নারীদের তথ্য পাওয়ার অধিকার, যথাযথ নিয়োগ, কর্মস্থলে নিরাপত্তা এবং মর্যাদা নিশ্চিত করাসহ সব ধরনের অধিকার সংরক্ষণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ।

১১. জাতিগত ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসীসহ বিভিন্ন প্রান্তিক নারীদের জন্য যথাযথ নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর নারী যেন তাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বসবাস করতে পারে তার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ।

১২. আমাদের দেশে লোকজ জ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবক মূলত নারী। প্রাকৃতিক ও সামাজিক দুর্যোগে এই জ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্যদিয়ে নারীরা পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে সবসময় অবদান রেখে যাচ্ছে। যথাযথ রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও উদ্যোগের অভাবে এই জ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর থেকে নারীদের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ আস্তে আস্তে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর হাতে চলে যাচ্ছে। পরে যা আবার আমাদের দেশের গরিব মানুষই চড়াদামে কিনতে বাধ্য হচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি লোকজ জ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আধুনিকীকরণের

মাধ্যমে নারীকেন্দ্রিক করার জন্য সরকারের উদ্যোগ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন যা আমাদের দুর্যোগ মোকাবিলা এবং জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচনে বড় ভূমিকা রাখবে।

১৩. নারীর প্রতি নেতিবাচক, অবমাননাকর, সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে গণমাধ্যমের সঠিক ভূমিকা, প্রচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রচার মাধ্যমের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ নিশ্চিত করা। এর পাশাপাশি গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৪.প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চপর্যায়ে, বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোতে রাষ্ট্রদূত ও জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা, আন্তর্জাতিক সংগঠনে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, পরিকল্পনা কমিশন, সরকারি কর্মকমিশন, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, স্থানীয় সরকার কমিশন, ভূমি বন্টন কমিটি এবং উচ্চ আদালতসহ বিচার বিভাগে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ।

১৫. নারীর প্রতি বৈষম্য কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের বাজেট তৈরি এবং তা বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ। জেন্ডার অডিটিং-এর ব্যবস্থা করা।

১৬. রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল প্রতিষ্ঠানে নারীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নীতিগত, কাঠামোগত, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং জনপ্রতিনিধিদের দায়-দায়িত্ব, ভূমিকা ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে যথোপযুক্ত করা।

১৭. নারী-পুরুষের জন্য আলাদাভাবে তথ্য-উপাত্ত পাওয়ার জন্য একটি 'ইনফরমেশন ডাটা ব্যাংক' গড়ে তোলা।

সূত্র : লেখক : রঞ্জন কর্মকার, নির্বাহী পরিচালক, স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট

শিক্ষা

আই.এল.টি.এস কেন এবং কিভাবে

যারা বিভিন্ন ইংরেজি ভাষার দেশে লেখাপড়া বা কাজ করতে চান, তাদের ভাষার দক্ষতা নির্ণয় করার জন্য আন্তর্জাতিক ইংরেজি ভাষা দক্ষতা নির্ণয় পরীক্ষা হলো International English language Testing System (IELTS)-IELTS ইউনির্ভাসিটি অব ক্যামব্রিজ ইএসওএল (ESOL) এ্যামিনেশনস, ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং আইডিপি আইইএলটিএস অস্ট্রেলিয়া কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত হয়। ভাষার দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য আইইএলটিএস সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি পরীক্ষা। ভাষার চারটি দক্ষতা - লিসেনিং, রিডিং, রাইটিং এবং স্পিকিং এই পরীক্ষার অন্তর্ভূক্ত। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং চাকুরীদাতা কর্তৃক আইএলটিএস স্বীকৃত। পেশাজীবী সংগঠন, অভিবাসন কর্তৃপক্ষ এবং অনান্য সরকারি সংস্থা দ্বারাও এটি স্বীকৃত। ১৬ বছরের নিচে আইএলটিএস পরীক্ষায় অংশ নেয়া যায় না।

জেনারেল ট্রেনিং

যদি নার্সিং/মেডিক্যাল কাউন্সিলে আবেদন করতে চান অথবা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে চান তাহলে আপনাকে একাডেমিক মডিউল দিতে হবে। যদি আপনি মাধ্যমিক পর্যায়ের পড়াশুনা বা চাকরী ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন বা কোন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নেয়ার জন্য যেতে চান অথবা অভিবাসনের উদ্দেশ্যে আইএলটিএসের প্রয়োজন হয় তাহলে আপনাকে জেনারেল ট্রেনিং মডিউল পছন্দ করার আগে পরীক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট সংস্থার ভর্তির প্রাক-যোগ্যতা সম্পর্কে জেনে নেয়া উচিত।

কিভাবে রেজিস্ট্রি করবেন

আইইএলটিএসের রেজিস্ট্রেশনের জন্য http://www.britishcouncil.org/bangladesh থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করতে পারেন। আবেদনপত্রের সঙ্গে আপনাকে পরীক্ষা ফি, পাসপোর্ট, পাসপোর্টের প্রথম চার পৃষ্ঠার ফটোকপি, তিন কপি সম্প্রতি তোলা (৬ মাসের বেশি পুরোনো নয় এমন) পাসপোর্ট আকারের রঙিন ছবি জমা দিতে হবে। আপনার রেজিস্ট্রেশন ফরম ব্রিটিশ কাউন্সিল অফিস অথবা স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ব্রাঞ্চের সার্ভিস বুথে জমা দিন। টেস্ট ফি আপনি সরাসরি ব্রিটিশ কাউন্সিলে জমা দিতে পারেন, ব্যাংক ড্রাফট বা নগদ অর্থের মাধ্যমে ব্রিটিশ কাউন্সিলের

ডিপোজিট স্লিপ পূরণ করে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের শাখাগুলোতে। আবার ইচ্ছা করলে আপনি টেস্ট ফি ব্যাংক ড্রাফট/নগদ অর্থের মাধ্যমে ব্রিটিশ কাউন্সিলের যেকোন শাখায় জমা দিতে পারেন।

পরীক্ষা পূর্ববর্তী তথ্য কখন, কিভাবে জানবেন

পরীক্ষার কেন্দ্র, স্পিকিং টেস্টের সিডিউল এবং অন্যান্য প্রাক পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য এসএমএসর মাধ্যমে আপনাকে জানিয়ে দেয়া হবে। এসব তথ্য পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে এবং http://www.britishcouncil.org/bangladesh এই ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।

স্পিকিং টেস্ট কখন হবে

স্পিকিং টেস্ট পরীক্ষার আগের চারদিন বা পরীক্ষার দিন অথবা পরীক্ষার সাত দিনের মধ্যে হতে পারে। পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই ইন্টারভিউ শুরু হওয়ার এক ঘন্টা আগে পরীক্ষা কেন্দ্রে রিপোর্ট করতে হবে। কোন কারণে প্রাক পরীক্ষা তথ্য না পেয়ে থাকলে কমপক্ষে পরীক্ষার চার দিন আগে ব্রিটিশ কাউন্সিলে যোগাযোগ করুন অথবা http://www.britishcouncil.org/bangladesh এই ওয়েব সাইটে ক্লিক করুন। স্পিকিং পরীক্ষার চারদিন আগে স্পিকিং টেস্টের সময়সূচি এই ওয়েবসাইটে এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল অফিসসমূহের বাইরে দেয়া থাকে।

পরীক্ষার দিন কি কি আনতে হবে

পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই সেই পাসপোর্ট নিয়ে আসতে হবে যা পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের সময় ব্যবহৃত হয়েছিল। পাসপোর্ট সম্পূর্ণ আইইএলটিএস পরীক্ষার জন্য 'স্টেটমেন্ট অব এন্ট্রি/প্রবেশপত্র হিসেবে বিবেচিত হবে এবং পরীক্ষা চলাকালে আপনার ডেস্কের উপর রাখতে হবে যাতে পরীক্ষায় নিয়োজিত স্টাফ আপনার পরিচয় চেক করতে পারেন। নিজের ব্যবহারের জন্য স্টেশনারি দ্রব্যাদি যেমন: পেন্সিল, কলম, ইরেজার, শার্পনার এবং রুলার সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। পরীক্ষার হলে বই, ব্যাগ এবং মোবাইল ফোন আনা যাবেনা।

কখন কিভাবে আপনার ফলাফল পাবেন

পরীক্ষার পর ১২তম দিনে ফলাফল প্রকাশিত হয়। আপনার ঠিকানায় পরীক্ষার চৌদ্দ দিনের মধ্যে ফলাফল পাঠানো হবে। যদি আপনি ব্রিটিশ কাউন্সিলের কোন অফিস থেকে ফলাফল সংগ্রহ করতে চান তবে পরীক্ষার দিন তা জানাতে হবে। ফলাফল সংগ্রহ করার জন্য আপনাকে পাসপোর্ট আনতে হবে। আপনি http://www.britishcouncil.org/bangladesh এবং http://ielts-results.britishcouncil.org এই ওয়েব সাইটগুলো থেকে রেজাল্ট সংগ্রহ করতে পারেন। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি সংস্থা, পেশাজীবী সংগঠন বা চাকরীদাতার কাছে ফলাফল পাঠাতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঠিক ও নির্ভুল যোগাযোগের ঠিকানা দিতে হবে এবং তাদের ফাইল বা কেস নম্বর জানা থাকলে সংযুক্ত করতে হবে। আপনি সর্বোচ্চ পাচটি ঠিকানায় আপনার ফলাফল পাঠাতে পারবেন। ফি দিয়ে পিএইচএলের মাধ্যমেও ফলাফল জানা যাবে। তবে সাধারণ ডাকে ফলাফল পেতে কোন ফি দিতে হবে না। রেজাল্ট শিট লেমিনেট করা যাবে না, কারণ লেমিনেশনে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কিছু তথ্য ব্লক হয়ে যাবে। কিছু প্রতিষ্ঠান লেমিনেটেড রেজাল্ট শিট গ্রহণ করে না।

ফলাফল পূণরায় পরীক্ষা করতে

আপনি ফলাফল অনুসন্ধান করার জন্য আবেদন করতে পারেন। আবার আপনি http://www.britishcouncil.org/bangladesh এই ওয়েব সাইট থেকেও আবেদনপত্র ডাউনলোড করতে পারেন। এজন্য আবেদনপত্রের সাথে আপনার রেজাল্ট শিটের একটি কপি সংযুক্ত করতে হবে এবং ফলাফল প্রকাশের চার সপ্তাহের মধ্যেই জমা দিতে হবে। পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রে পুন:নম্বর প্রদান প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারিক্যাল নম্বর প্রদায়ক এবং ক্যামব্রিজ ইএসওএল কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ও ব্রিটিশ কাউন্সিল নিয়োজিত সিনিয়র পরীক্ষক দ্বারা সম্পাদন করা হয়। পুণ:নিরীক্ষার জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিলে অগ্রিম ফি প্রদান করতে হবে। রেজাল্ট উচ্চতর ব্যান্ড স্কোর উন্নীত হলেই শুধু পুন:নিরীক্ষণ ফি ফেরত দেয়া হবে। সাধারণত ছয় থেকে আট সপ্তাহের মধ্যেই আপনার পুন:নম্বরকৃত রেজাল্ট ফিরে পাবেন এবং তখন কর্তৃপক্ষ আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে

পরীক্ষার তারিখের পাচ সপ্তাহ আগে রেজিস্ট্রেশন বাতিল করলে প্রশাসনিক ফি কেটে রেখে ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে বাকি ফি ফেরত দেয়া হবে। এজন্য আপনি http://www.britishcouncil.org/bangladesh এই ওয়েব সাইট থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করে পূরণকৃত আবেদন ফরমের সাথে মূল টাকার রসিদ সংযুক্ত করুন। যেসব কারণে আপনি পরীক্ষা ফি ফেরত পেতে পারেন সেগুলো হলো অসুস্থতা যেমন- হাসপাতালে ভর্তি হওয়া বা গুরুতর আহত হওয়া (সামান্য অসুস্থতা যেমন ঠাণ্ডা লাগা ইত্যাদি এর অন্তর্ভূক্ত নয়), কোন মৃত্যুজনিত শোক, অপরাধ বা সড়ক দূর্ঘটনার শিকার হয়ে মানসিক বা শারিরীক দূর্ভোগ, সামরিক দায়িত্ব। পরীক্ষার পাচ দিন পর কোন রিফান্ড আবেদন গৃহীত হবে না।

লিসনিং টেস্টের জন্য অয়্যারলেস হেডফোন সাউন্ড সিস্টেম: বাংলাদেশে ব্রিটিশ কাউন্সিলই একমাত্র টেস্ট সেন্টার যেখানে লিসনিং টেস্টের জন্য বিশ্বমানের তারবিহীন হেড ফোনের ব্যবস্থা আছে।

মক টেস্ট

মক টেস্টগুলো পরীক্ষার্থীদের রিডিং, রাইটিং এবং লিসনিং পরীক্ষার জন্য মূল্যবান প্রস্তুতির সুযোগ দেয়। এছাড়া এই দক্ষতাগুলোর ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের নিজস্ব ক্ষমতা সম্পর্কেও ধারণা দেয়। এই টেস্টগুলো ইউনিভার্সিটি অব ক্যামব্রিজ দ্বারা পরীক্ষিত হয় এবং এর ফলাফল দুই সপ্তাহের মধ্যে পাওয়া যায়।

প্রস্তুতিমূলক ক্লাস

আইইএলটিএস পরীক্ষায় ভালো স্কোর অর্জনের জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিল টিচিং সেন্টার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। জেনারেল এবং একাডেমিক মডিউলে এই কোর্সের মেয়াদ আট সপ্তাহ এবং প্রতি সপ্তাহে দুটি করে কোর্স হিসেবে মোট সময় ৩২ ঘন্টা।

বিশেষ প্যাকেজ

ব্রিটিশ কাউন্সিল আইইএলটিএস বেসিক (শুধু পরীক্ষা দেয়া যাবে), আইএলটিএস প্লাস (পরীক্ষা + একদিনের কর্মশালা বা সেল্ফএকসেস সেন্টার/লাইব্রেরীর সদস্যপদ), আইইএলটিএস প্রিমিয়ার (পরীক্ষা + একদিনের কর্মশালা + সেল্ফএকসেস সেন্টার/লাইব্রেরীর সদস্যপদ) ইত্যাদি প্যাকেজের আয়োজন করে থাকে।

যোগাযোগ

ব্রিটিশ কাউন্সিল, ৫ ফুলার রোড, ঢাকা, ফোন-৮৬১৮৯০৫-৭; ইমেইলঃ dhaka.enquiries@bd.britishcouncil.org; bd.britishcouncil.org এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল ৭৭/ এ পূর্ব নাসিরাবাদ chittagong.enquiries@bd.britishcouncil.org; bd.britishcouncil.org

---

সচেতনতা

অফলাইন তথ্যভাণ্ডার

তথ্যসেবা প্রদানের অনেকগুলো মাধ্যমের মধ্যে একটি অন্যতম মাধ্যম হলো অফলাইন তথ্যভান্ডার। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন ধরনের অফলাইন তথ্যভান্ডার তৈরি করেছে। তাদের মধ্যে অন্যতম একটি হলো জীয়ন-তথ্যভাণ্ডার (বাংলাভাষায় প্রস্তুত তথ্যভাণ্ডার যা ব্যবহার করতে ইন্টারনেট প্রয়োজন হয় না)। নিম্নে জীয়ন-তথ্যভান্ডার সর্ম্পকে বিস্তারিত ধারণা এবং এই তথ্যভান্ডার ব্যবহার করে কিভাবে তথ্য দেয়া সম্ভব তা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

জীয়ন

সার্বিক জীবন-মান উন্নয়নের জন্য বাংলাভাষায় তৈরী ডিজিটাল তথ্য ভাণ্ডার বর্তমান বিশ্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উত্তরোত্তর বিকাশ দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডকে নানাভাবে প্রভাবিত করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলো এ সুযোগের সদ্ব্যবহার থেকে অনেক পিছিয়ে আছে যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সত্য। এই সত্যটি এদেশের গ্রামাঞ্চলগুলোর ক্ষেত্রে আরো বেশী প্রযোজ্য। শহরাঞ্চলের চাইতে গ্রামাঞ্চলে এখনও তথ্য প্রযুক্তির বিষয়টি অধিকাংশেরই অজানা, ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে নানা দিক থেকে ক্রমশ: ব্যবধান বেড়েই চলেছে।

বাস্তবতা এবং মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় পল্লীবাসীর জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নের একটি বড় বাধা হচ্ছে তাদের কাছে সঠিক সময়ে সঠিক ও প্রয়োজনীয় তথ্য না পৌঁছানো। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে পল্লীবাসীর দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রয়োজনীয় সঠিক তথ্যের প্রবেশাধিকার সঠিক সময়ে নিশ্চিত করে উন্নয়ন তথা দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বেসরকারি গবেষণামূলক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ডি.নেট (ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ নেটওয়ার্ক) বাংলা ভাষায় গড়ে তুলেছে একটি তথ্যভান্ডার 'জীয়ন'। 'জীবনের জন্য তথ্য' স্লোগানকে সামনে রেখে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ হচ্ছে জীয়ন তথ্যভাণ্ডার।

জীয়ন তথ্য ভান্ডারটি এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে রয়েছে সহজ পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পাওয়ার ব্যবস্থা, নতুন উদ্যোগীকে অনুপ্রাণিত করতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের সাফল্যের কাহিনী, নতুন কোনো বিষয়ে তথ্যের চাহিদা তৈরি হলে পরবর্তী সংস্করণে সংযুক্তির ব্যবস্থা। এখানে প্রাসঙ্গিক চিত্র সংযোজিত রয়েছে যাতে চিত্রগুলো দেখে নির্দিষ্ট তথ্যটি সহজেই বোধগম্য হয়। জীয়ন-তথ্য ভান্ডার ব্যবহারের জন্য ইন্টারনেট সংযোগের প্রয়োজন হয় না এবং এটি পল্লী জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষভাবে উপযোগী, এমনকি অক্ষর জ্ঞানহীন মানুষও তথ্যকর্মীর সহায়তায় তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে জীবনযাত্রার ব্যয় কমাতে অথবা আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। তবে যে সব এলাকায় ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে গেছে সেখানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

মোট দশটি প্রধান বিষয়ে যেমন জীয়ন-কৃষি, জীয়ন-স্বাস্থ্য, জীয়ন-শিক্ষা, জীয়ন-আইন ও মানবধিকার, জীয়ন-অকৃষি উদ্যোগ, জীয়ন-লাগসই প্রযুক্তি, জীয়ন-সচেতনতা, জীয়ন-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জীয়ন-পল্লী কর্মসংস্থান এবং জীয়ন-ঠিকানা নিয়ে গড়ে উঠেছে জীয়ন তথ্যভাণ্ডার।

ক) জীয়ন-কৃষিঃ তথ্য ভাণ্ডারে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কৃষি পণ্য যেমন মাঠফসল, শাক-সজি, ফলমুল, মসলা চাষ, ফুল ও ঔষধি গাছ, মৎস্য সম্পদ, পশুসম্পদ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য। এখানে সুনির্দিষ্টভাবে আছে বিভিন্ন ফসলের জাত পরিচিতি, চাষাবাদ পদ্ধতি, ক্ষতিকর পোকা-মাকড় ও রোগবালাই দমন, অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা, সার ব্যবস্থাপনা, উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের হিসাব, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাত করনের পদ্ধতি ইত্যাদি। এছাড়াও মাটি ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত চাষাবাদ, আন্তঃফসল, শস্য পর্যায়, কৃষি যন্ত্রপাতি পরিচিতি এবং কৃষিতে কিছু সফলতার কাহিনী সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে। কৃষি তথ্য ব্যবহার করে একদিকে যেমন একজন কৃষক কৃষি বিষয়ক সঠিক পরামর্শ নিয়ে ভালো উৎপাদন পেতে পারেন ঠিক তেমনি কৃষি সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান এ তথ্য ব্যবহার করে তাদের সেবার মান আরও উন্নত করতে পারেন।

খ) জীয়ন-স্বাস্থ্যঃ তথ্যভাণ্ডারে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের রোগের বিস্তারিত তথ্য। এসকল তথ্যের মধ্যে রয়েছে স্নায়ুতন্ত্র, চোখ, দাঁত, নাক-কান-গলা, হৃদপিণ্ড, শ্বাসতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র, মূত্রতন্ত্র, যৌন, চর্ম ও হাড়ের

নানা ধরনের রোগের লক্ষণ, প্রতিকার ও রোগের বিস্তার প্রতিরোধ সংক্রান্ত তথ্য। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, এ তথ্য ভাণ্ডারে কোনো রোগের প্রতিরোধে ঔষধ সেবনের পরামর্শ প্রদান থেকে বিরত থাকা হয়েছে। কারণ চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত কোনো ঔষধ সেবন উচিৎ নয়। অঙ্গভিত্তিক রোগের বিবরণের পাশাপাশি এ তথ্য ভাণ্ডারে রয়েছে সাধারণ স্ত্রী রোগ, গর্ভকালীন সমস্যা, শিশু রোগ, হরমোন জনিত রোগ, নানা ধরনের সংক্রামক রোগ, মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ, ভিটামিন সংক্রান্ত তথ্য, ক্যান্সার, অপারেশন বা সার্জারী তথ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক তথ্য। এসকল তথ্যগুলো যেমন একজন সচেতন মানুষ ব্যবহার করতে পারেন পাশাপাশি স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কিংবা স্বাস্থ্য কর্মী এ তথ্য ব্যবহার করে তাদের সেবার মান আরও উন্নত করতে পারেন।

গ) জীয়ন-শিক্ষা: তথ্যভাণ্ডারের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামের অবহেলিত ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষার বিভিন্ন পরিসর এবং নানা সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য পৌঁছে দেয়া। এ তথ্যভাণ্ডারে রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ভকেশনাল ইনস্টিটিউট ইত্যাদির প্রতিটি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা, ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য। দেশে ও দেশের বাইরে পড়াশোনার সুযোগ, শিক্ষা বৃত্তি ও শিক্ষা ঋণ সংক্রান্ত তথ্য, গুরুত্বপূর্ণ পাঠাগার সংক্রান্ত তথ্য, বিভিন্ন ধরনের কোচিং সেন্টারের তথ্য ইত্যাদি। পাশাপাশি এ সিডিতে প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও সুযোগ সংক্রান্ত নানা ধরনের তথ্য এবং বাংলাদেশের শিক্ষানীতির বিশদ বিবরণ রয়েছে। শিক্ষা তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করে ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষক, অভিভাবক এবং শিক্ষা নিয়ে কর্মরত গবেষকবৃন্দও উপকৃত হবেন।

ঘ) জীয়ন-আইন ও মানবাধিকার: তথ্য ভাণ্ডারে রয়েছে ভূমি, উত্তরাধিকার, নারী অধিকার, শিশু অধিকার, বিভিন্ন আইন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন ইত্যাদি। ভূমি আইনের মধ্যে বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্টভাবে রয়েছে খাস জমি, জমি বেদখল, বাটোয়ারা, ভূমি জরিপ, বর্গাচাষ, ওয়াক্ফ, রেজিস্ট্রেশন, দলিল সম্পাদন, ভূমি উন্নয়ন কর, সিকস্তি-পয়স্তি, চরদখল, নিলাম আইন সংক্রান্ত তথ্য। এছাড়াও রয়েছে মুসলিম ও হিন্দু আইনে উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি বন্টনের নিয়ম ও তার প্রয়োগ; নারী অধিকারের বিষয়বস্তুতে বিয়ে, তালাক, যৌতুক, ভরণপোষন, দেনমোহর, অভিভাবকত্ব, বহুবিবাহ, এসিড নিক্ষেপ, বাল্য বিবাহ, ধর্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কিত আইন ও এর প্রয়োগ; শিশুদের অধিকার ও শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন ও কনভেনশন। তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করে অধিকার বঞ্চিত মানুষেরা পেতে পারেন তাদের অধিকার সম্পর্কিত তথ্য এবং প্রতিকার পাবার প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা। পাশাপাশি আইনজীবীসহ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কর্মরত কর্মী এ সিডির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য ও আইনের সহজ ব্যাখ্যা পেতে পারেন যা তাদের কার্যক্রমকে আরো সাবলীলভাবে করতে সহযোগীতা করবে।

ঙ) জীয়ন-অকৃষি উদ্যোগ: তথ্য ভাণ্ডারে রয়েছে আয় বৃদ্ধিতে সহযোগী নানান কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য যা থেকে একজন উদ্যোক্তা ক্ষুদ্র পরিসরে বিনিয়োগ করে আত্মকর্মসংস্থানের পথ খুঁজে নিতে পারেন। বাঁশ, বেত, চট নারকেলের ছোবড়া, কাগজ ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন উপকরণ তৈরির পদ্ধতি; কাপড়ে ব্লক, বাটিক, স্ক্রিন প্রিন্ট করা; বই ছাপানো, মুদি দোকান, ফুলের দোকান, ক্যাটারিং, ধান ভাঙ্গানো, বিউটি পার্লার ইত্যাদির ব্যবসা; বই বাঁধাই, ছবি বাঁধাই, ব্যানার সাইনবোর্ড তৈরি, বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত নিয়ে ব্যবস্যা; রাবারের চপ্পল তৈরি, কাঠের ব্লক তৈরি, পাউরুটি বিস্কিট, মুড়ি, চানাচুর, কেক, আগরবাতি, মোমবাতি, সাবান, চক ইত্যাদি আরো অনেক ধরনের পণ্য ও খাবার সামগ্রী তৈরির উপায় নিয়ে বিস্তারিত তথ্য। তথ্য ভাণ্ডারে আরো সুনির্দিষ্টভাবে রয়েছে প্রতিটি পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়া, প্রয়োজনীয় উপাদান, কাঁচামাল ও অন্যান্য উপাদানের আনুমানিক বাজারমূল্য ও প্রাপ্তিস্থান, বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া ইত্যাদি। গ্রামের ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা এ তথ্য ভান্ডার ব্যবহার করে তার পুঁজির সর্বোচ্চ বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে পারেন।

চ) জীয়ন-লাগসই প্রযুক্তি: সিডিতে রয়েছে উন্নত চুলা, স্বল্প ব্যয়ে বাড়ি তৈরি, স্যানিটেশন প্রযুক্তি, পানিকে আর্সেনিক মুক্ত করার উপায়, খাবার পানি সংগ্রহের উপায়, গোবর ও বজ্য পদার্থ থেকে বায়োগ্যাস,

কম্পোস্ট ও অন্যান্য সার তৈরির উপায়, সৌর বিদ্যুৎ কাজে লাগানোর উপায়, কৃষি কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহারের বিবরণ। আরো রয়েছে বাঁশ, খড়, কাঠ, ছন ইত্যাদি কিভাবে আরো টেকসই করা যায় তার বিভিন্ন উপায়। এছাড়াও লোকজভাবে উদ্ভাবিত বিভিন্ন লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তির বিবরণ। এ তথ্য ভাণ্ডার দৈনন্দিন কাজকে আরো সহজ করে তুলতে, গৃহে ব্যবহৃত প্রতিটি জিনিসের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে, সংসারের ব্যয় কমাতে এবং নতুন আয়ের পথ খুলে দিতে যথেষ্ট সহায়ক ভুমিকা রাখবে।

ছ) জীয়ন-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: তথ্য ভাণ্ডারের প্রধান লক্ষ্য হলো দুর্যোগ মোকাবিলায় কি কি পদক্ষেপ ও প্রস্তুতি গ্রহণ করলে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা যায়। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, আর্সেনিক, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য দুর্যোগের আগে, দুর্যোগের সময় ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে আমাদের কি কি করা দরকার সে সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে এ তথ্য ভাণ্ডারে। এছাড়াও দুর্যোগকালীন বিভিন্ন রোগব্যাধি যেমন ডাইরিয়া, সাপের কামড়, পনিতে ডোবা ইত্যাদি সমস্যায় আমাদের কি করণীয় সে সম্পর্কিত সচেতনতামূলক তথ্য রয়েছে। এখান থেকে লোকজ পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বে কারা থাকেন এবং দুর্যোগের আগে, দুর্যোগের সময় ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কি কি ধরনের দায়িত্ব তারা পালন করেন সে সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিহত করা সম্ভব না হলেও এসকল সচেতনতামূলক তথ্য ব্যবহার করে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা অনেকাংশেই সম্ভব।

জ) জীয়ন-সচেতনতা: তথ্য ভাণ্ডারে রয়েছে নারী ও শিশু পাচার, আর্সেনিক, মাদকাসক্তি, কুষ্ঠরোগ, খাদ্য ও পুষ্টি, গর্ভকালীন ও প্রসব পরবর্তী বিষন্নতা, ভেজাল খাবার, নিরাপদ পানি, প্রতিবন্ধীদের অধিকার, ধুমপান, সামাজিক বনায়ন, ভোটাধিকার, নাগরিক অধিকার, পলিথিন ব্যবহার, স্কুলে শিশুর শারীরিক শাস্তি ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতামূলক তথ্য। এসকল তথ্য গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে আরো সচেতন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। গ্রাম পর্যায়ে কর্মরত উন্নয়ন সংগঠনের কর্মীবৃন্দের জন্য জীয়ন-সচেতনতা তথ্য ভাণ্ডার বিশেষ সহায়ক ভুমিকা রাখবে।

ঝ) জীয়ন-পল্লীকর্মসংস্থান: তথ্য ভাণ্ডারের প্রধান উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ জনসাধারণের কাছে তার আশেপাশের এলাকায় যেসব প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর সুযোগ আছে সেসব সুযোগের তথ্য পৌঁছে দেয়া। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে চাকুরীর বিজ্ঞপ্তির তথ্য সংগ্রহ করে তা এ তথ্য ভাণ্ডারে প্রতিদিন সংযোগ করা হয়। যেহেতু এ তথ্য ভাণ্ডারটি প্রতিদিন আপডেট করতে হয় সেহেতু এটি সরাসরি ওয়েবসাইটে নিয়ন্ত্রন করা হয়। যেকোন ব্যক্তি ইন্টারনেট ব্যবহার করে সরাসরি ওয়েভসাইট থেকে খুঁজে নিতে পারবেন পছন্দনীয় এলাকার এবং পছন্দনীয় বিষয়ে চাকুরীর খবর। শিক্ষাগত যোগ্যতা ধরে কিংবা, কাঙ্খিত জেলার নাম ধরে কিংবা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান ধরে কোন চাকুরীর সুযোগ আছে কিনা তা সহজেই বের করা যাবে।

ঞ) জীয়ন-ঠিকানা: তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করে কৃষি, বনায়ন, মৎস্য, পোল্ট্রি ও পশু সম্পদ, খাদ্য সামগ্রী সংরক্ষণ, নির্মাণ সামগ্রী, যানবাহন, দক্ষতা বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, স্বাস্থ্য, সংবাদ পত্র ও সংবাদ সংস্থা, নিরাপত্তা, শিক্ষা, আইন ও মানবাধিকার, বাজার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, হোটেল, এনজিও, সাইকেল ও অটোমোবাইল, যোগাযোগ সেবা এবং অ-কৃষি অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ইত্যাদি বিষয়ে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, বিস্তারিত ঠিকানা, তাদের প্রদানকৃত বিভিন্ন সেবা এবং সেবার সম্ভাব্য খরচ সহজেই জানা যাবে। এ তথ্য ভান্ডার একদিকে যেমন সকলের মূল্যবান সময় বাচাবে অন্যদিকে সেবা গ্রহণের খরচ কমবে, পাশাপাশি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতামুলক বাজারে টিকে থাকতে হলে তাদের সেবার মান আরো উন্নত করবে। এ পর্যায়ে এ তথ্য ভাণ্ডারে; ঢাকা, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালি, ফেনী, নীলফামারী, দিনাজপুর, রংপুর জেলার প্রতিষ্ঠান সমূহের তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে। তবে কারিগরী শিক্ষা ও প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা বিষয়ে সারা বাংলাদেশে কর্মরত প্রতিষ্ঠান সমূহের ঠিকানা রয়েছে এ তথ্যভাণ্ডারে।

লাগসই প্রযুক্তি

তথ্য ও প্রযুক্তি

তথ্য ও প্রযুক্তির যুগে তথ্যসেবা এবং তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজন একটি যুগোপযুগি তথ্য কেন্দ্রের। আর এ তথ্য কেন্দ্রের কার্যক্রমকে সার্থক ও সাবলীল করার জন্য প্রয়োজন দক্ষ তথ্যকর্মীর। একজন দক্ষ তথ্যকর্মী হওয়ার জন্য প্রয়োজন তথ্য, তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক ধারণা ও যথাযথ জ্ঞান। এবং উক্ত বিষয়গুলো আত্বস্থ করার জন্য প্রয়োজন কার্যকরী প্রশিক্ষণের। তথ্যকেন্দ্র বা টেলিসেন্টার ও তথ্যকর্মী সর্ম্পকে ধারণা:

টেলিসেন্টার কি?

- টেলিসেন্টার হলো সর্বসাধারণের গমনাগমনের জন্য একটি সাধারণ স্থান;
- যেখান থেকে তাঁরা তাদের জীবন-জীবিকার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক তথ্য পেতে পারে;
- যেখান থেকে তাঁরা তাদের জীবন-জীবিকার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সেবা পেতে পারে;
- যা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন মাধ্যম যেমন কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করে সংগ্রহ করতে পারে;
- যা মূলত সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় সঠিক তথ্যের প্রবাহ নিশ্চিত

করে জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে কার্যকারী ভূমিকা রাখে

- বিভিন্ন দেশে টেলিসেন্টার ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত, এমনকি প্রতিষ্ঠান ভেদে এর নামও ভিন্ন। বাংলাদেশে ডি.নেটের উদ্যোগে লোকজ প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে পরিচালিত টেলিসেন্টারগুলো পল্লীতথ্য কেন্দ্র নামে পরিচালিত।

টেলিসেন্টার কাদের জন্য?

- সমাজে সুবিধাবঞ্চিত, নারীসহ সকল শ্রেণীর মানুষকে তথ্য ও পরামর্শ সেবা প্রদানের জন্য টেলিসেন্টার কাজ করবে;
- টেলিসেন্টার থেকে তথ্য সেবা গ্রহণে কোন ভাবেই কোন ব্যক্তি বাদ পড়বে না কিংবা বঞ্চিত হবে না।

টেলিসেন্টার কেন দরকার?

- বর্তমান বিশ্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উত্তরোত্তর বিকাশ দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নানাভাবে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলো এ সুযোগ থেকে অনেক পিছিয়ে আছে যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সত্য, আরো বেশী সত্য এদেশের গ্রামাঞ্চলগুলোর ক্ষেত্রে;
- গ্রামগুলোতে এখনও তথ্য প্রযুক্তির বিষয়টি অধিকাংশেরই অজানা যার ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে নানা দিক থেকে ব্যবধান ক্রমশ: বেড়েই চলেছে;
- এসমস্ত বাস্তবতা এবং মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় পল্লীবাসীর জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নের একটি বড় বাধা হচ্ছে তাদের কাছে সঠিক সময়ে সঠিক ও প্রয়োজনীয় তথ্য না পৌঁছানো;
- সঠিক সময়ে সঠিক ও প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে বর্তমানে কার্যকারী ভূমিকা রাখছে কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদি ছাড়াও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন মাধ্যম;
- কিন্তু যেখানে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে, নুন আনতে পানতা ফুরায় সেখানে তাদের কাছে কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট এগুলো অকল্পনীয়;
- প্রত্যেকে কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি কিনে বাড়িতে বসে নিজে ব্যবহার করবে এটা আরও অকল্পনীয়;
- এসকল প্রতিকূলতা কাটিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য টেলিসেন্টারই হতে পারে একমাত্র স্থান যেখান থেকে সর্বসাধারন সংগ্রহ করবে তাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নানা তথ্য। প্রয়োজন হবে না প্রত্যেকের ঘরে ঘরে কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট থাকার; এগুলোর ব্যবহার বিধি না জানলেও সমস্যা নেই কেননা এ কাজে সহযোগিতার জন্য সবসময় থাকবে একদল দক্ষ তথ্যকর্মী।

নমুনা হিসাবে 'তথ্য কেন্দ্র' যেভাবে পরিচালিত হয় তা নিচের চক্রটির মাধ্যমে দেখানো হলো-

- তথ্যকর্মীর সহযোগিতায় বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে টেলিসেন্টারে বসেই সকলে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন;
- মোবাইল তথ্যকর্মী মোবাইল ফোন নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে যায় এবং

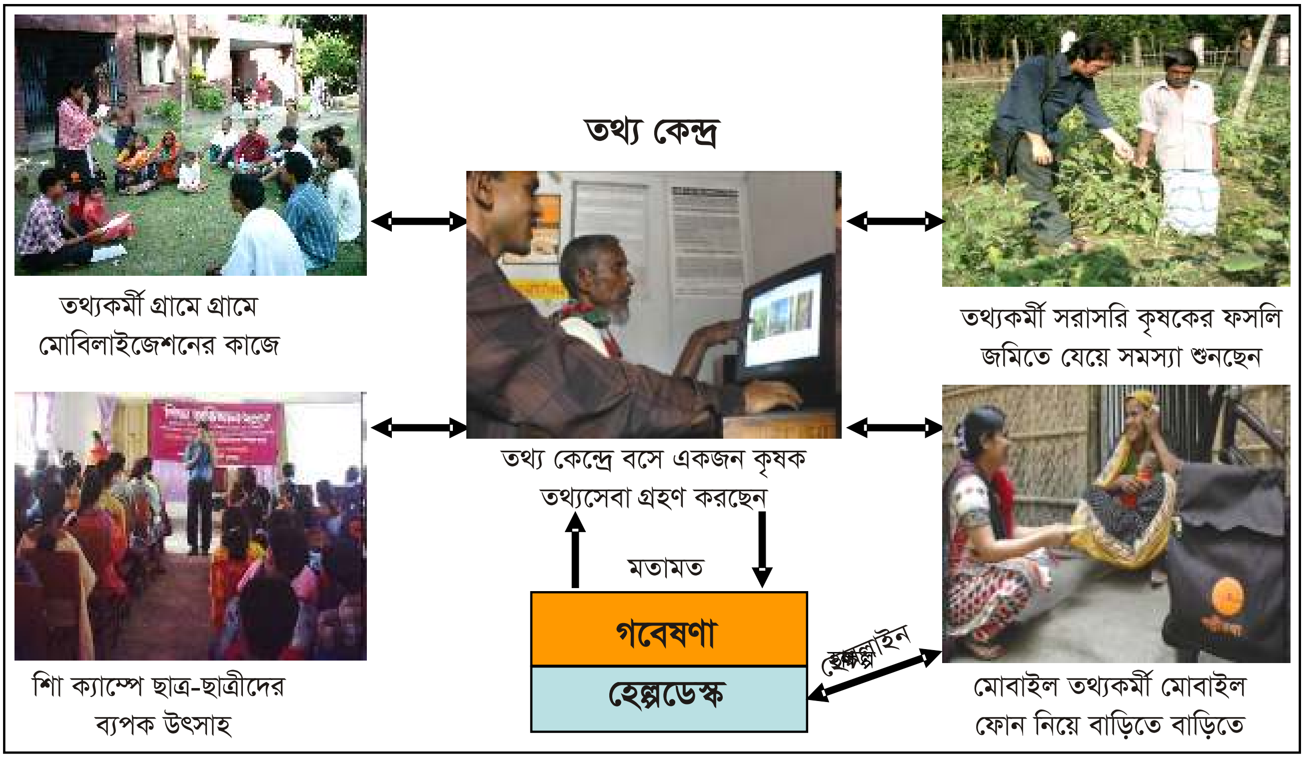

মানুষকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শের জন্য হেল্পডেস্কে বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন;

- তথ্যকর্মী সরাসরি বিভিন্ন পেশাজীবির কাছে যায়, তার সমস্যা শোনে এবং পরামর্শ পেতে সহযোগিতা করেন;
- তথ্যের গুরুত্ব বোঝাতে এবং মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি করতে তথ্যকর্মী গ্রামে গ্রামে মোবিলাইজেশনের কাজ করেন।

তথ্যকর্মীর কি যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা দরকার?

- খুব সহজে বুঝতে পারা এবং দ্রুত শেখার সক্ষমতা থাকতে হবে;
- সর্বশ্রেণীর মানুষের সাথে মেশার মানসিকতা এবং সক্ষমতা থাকতে হবে;
- সবার বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে হবে;
- ধৈর্য্যশীল হতে হবে;
- ভালো শ্রোতা হতে হবে;
- গুছিয়ে কথা বলতে পারদর্শী হতে হবে;
- মানুষের কল্যাণকর কাজে আগ্রহ থাকতে হবে;
- সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ থাকতে হবে;
- ভালো আচার-ব্যবহারের অধিকারী হতে হবে;
- আঞ্চলিক ভাষাজ্ঞান থাকতে হবে;
- নিজের এলাকা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে;
- মানুষকে আকৃষ্ট করার সক্ষমতা থাকতে হবে;
- নতুন কিছু জানা, শেখা এবং পড়ার আগ্রহ থাকতে হবে;
- সর্বোপরি নিজের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

ক্যারিয়ার

মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ সেলস ক্যারিয়ার

মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি হল একজন সেলস পার্সনের চাকরি। এ পেশায় মূল কাজটি হল, বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির নানা প্রোডাক্ট-এর সঙ্গে ডাক্তারদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং এসব ওষুধের ব্র্যান্ড পরিচিতির মাধ্যমে কোম্পানির গুডউইল প্রতিষ্ঠা করা। মোট কথা হল, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের কাজ হল চিকিৎসায় নিয়োজিত ডাক্তারদের কাছে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ভিজিট করে কোম্পানির বিভিন্ন প্রোডাক্টের সঙ্গে ডাক্তারদের পরিচয় করিয়ে প্রেসক্রিপশনের পাতায় সেই সব প্রোডাক্টের জায়গা করে নেওয়া। পাশাপাশি ঐ ওষুধগুলো যাতে বিভিন্ন ওষুধের দোকানে প্রয়োজন মতো পাওয়া যায়, তা সুনিশ্চিত করা। এ ছাড়া এলাকায় স্থানীয় স্টকিস্ট ও ডিস্ট্রিবিউটরদের সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষা করে যাওয়াও একজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের অন্যতম কাজ।

কারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ

মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ শব্দের আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ করা বেশ শক্ত। তবে অন্যান্য পেশার সেলসম্যানদের সঙ্গে এ পেশার সেলসম্যানদের পার্থক্যটা হল মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের সঙ্গে ক্রেতাদের সরাসরি যোগাযোগ থাকে না। তাই এটাকে বলা যেতে পারে এক ধরনের ইনডাইরেক্ট সেলস বা পরোক্ষ বিক্রি। অনেকে একে আবার নলেজ সেলিংও বলে থাকেন। স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যযুক্ত পেশা হিসেবে এর আত্মপ্রকাশ প্রায় তিন প্রজন্ম আগে। বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলোর মধ্যে ফার্মাসিউটিক্যাল বা ওষুধ উৎপাদন সবচেয়ে পুরানো। এই পেশায় প্রতিযোগিতা তীব্র। এটা যেহেতু কনসেপ্ট সেলিং, তাই কনসেপ্ট যত স্বচ্ছ হবে সেলিং হবে ততই স্বচ্ছল। মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের তাই কর্মজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হয়। অর্থাৎ, একই সঙ্গে মনোযোগী ছাত্র এবং কিছুটা হলেও শিক্ষাসুলভ মন নিয়ে এ পেশায় আসতে হবে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা এখন ১৫ কোটি। যত তা বাড়বে ওষুদের চাহিদাও ততই বাড়বে। তাই আমাদের দেশে ওষুধের বাজারটি বেশ বড়সর। আমাদের দেশে এখন অনেকগুলো ফার্মাসিটিক্যালস কোম্পানি হয়ে গেছে। পত্রিকায় প্রতিদিনই একটি দু'টি কোম্পানির মেডিকেল প্রোমোশন অফিসার বা মেডিক্যাল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পাচ্ছে।

কাজের শ্রেণীবিভাগ

মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের কাজের ধারা মোটামুটি দুটি। ১. ট্রেড ওয়ার্কিং, ২. ইনস্টিটিউশনাল ওয়ার্কিং। যারা নিয়মিত ডাক্তারদের মিট করে এবং রিটেলার, স্টকিস্ট, ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে যায়, তারা ট্রেড ওয়ার্কিং-এর সঙ্গে যুক্ত। আর যারা কোনও হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে গিয়ে একই ছাদের তলায় ১০-১২ জন ডাক্তারকে মিট করে কোম্পানির নানা ব্র্যান্ড নিয়ে বোঝায় তারা হল ইনস্টিটিউশনাল ওয়ার্কিং মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ।

বেতন

একজন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি ৬,০০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা দিয়ে কর্মজীবন শুরু হতে পারে। তবে কোম্পানির মানের উপর এটা নির্ভর করে। বড় বড় কোম্পানিগুলো ১২,০০০-১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত বেতন দিয়ে শুরু করে থাকে। কিন্তু এটা হচ্ছে সর্বমোট বেতন। মোটামুটি বছর তিনেকের মধ্যেই বেতন ২০,০০০ টাকায় পৌঁছে যায়। এছাড়া বেতনের পাশাপাশি বোনাস, কমিশন ও টিএ বিলেরও ব্যবস্থা হয়েছে।

বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা

প্রতিটি কোম্পানি বিগত বছরের ব্যবসা থেকে পরের বছরের ব্যবসাবৃদ্ধির একটা শতকরা হিসেব ঠিক করে নেয়। পুরোটাই কোম্পানির স্ট্র্যাটেজি এবং টিম ওয়ার্ক-এর উপর নির্ভর করে। টার্গেটে পৌঁছাতে বছরের প্রথম থেকেই মাস ধরে, সপ্তাহ ধরে লক্ষ্য

স্থির করে নিন। ব্যাক ক্যালকুলেশন করে নিন। কেমিস্টদের রিপোর্ট, ওআরজি ডাটা (মার্কেটে প্রেসক্রিপশন সার্ভে করে যারা), ডক্টরস লিস্ট, প্রোডাক্ট ট্রেইনিং নেওয়া থাকলে আর টেরিটরিকে হাতের তালুর মতো চিনে নিতে পারলে অবশ্যই উন্নতি হবে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, সব সিজনে সব প্রোডাক্টের প্রতিটি জেলায় একই রকম লক্ষ্য থাকে না। রুটিন ওয়ার্ক আর প্রখর সময়ানুবর্তিতাই এখানে সাফল্যের শেষ কথা। টার্গেট দেওয়া বা শেষে হিসাব বোঝানোর সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুর্যোগ, হরতাল, অবরোধ, শারীরিক অসুস্থতার বিষয়গুলি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মানবিকতার সাথে দেখে থাকে।

প্রশিক্ষণ

মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ পেশাতে নিয়োগের পর কোম্পানি ভেদে ২ থেকে ৬ মাসের ট্রেইনিং এর ব্যবস্থা রয়েছে। এই ট্রেইনিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই ট্রেইনিং থেকেই আপনার পেশার কার্যক্রম ঠিক করে নিতে পারবেন। ট্রেইনিং পিরিয়ডে কোম্পানি চাইবে আপনাকে দক্ষকর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে সকল কিছু করতে।

পদোন্নতি ও পদক্রম

মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ থেকে বিজনেস অফিসার, যেখান থেকে টেরিটরি ম্যানেজার, টেরিটরি এক্সিকিউটিভ হয়ে এরিয়া বিজনেস অফিসার বা ম্যানেজার। তারপর সোজা বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার হওয়া যায়। যার উপরে রয়েছে রিজিওনাল ম্যানেজার। তার উপর জোনাল ম্যানেজার। সুতরাং উপরে ওঠার সিঁড়িটায় চড়া কিন্তু শক্ত হলেও অসম্ভব নয়।

সামনে যখন ডাক্তার

প্রোডাক্ট ডেমো উপস্থাপন করার জন্য সময় পাওয়া যায় দু'মিনিট থেকে তিনি মিনিট। প্রোডাক্ট সম্পর্কে আপনার ধারণা যিনি শুনছেন তিনি কিন্তু মানবদেহ ও তার উপর ওষুদের কাজ, মলিকিউল, বন্ডিং, ফার্মাকোলজি সম্বন্ধে যথেষ্ট জেনে এসেছেন। এমনকি জুনিয়র ডাক্তারাও এগুলো পড়েছেন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ ডাক্তার হলেতো কথাই নেই। তাই উপর থেকে নীচের সব বয়সী ডাক্তারদের সাথে বুঝে শুনে কথা বলা উচিত। তিনি হয়ত আপনার আনা তিনটি প্রোডাক্ট থেকে দুটি প্রোডাক্ট প্রেসক্রিপশন করছেন। সেক্ষেত্রে আরেকটি নিয়ে প্রশ্ন না তুলে তাকে দুটি প্রোডাক্টের জন্য ধন্যবাদ জানান।

এই পেশায় সফল হওয়ার টিপস

- পেশার প্রতি আগ্রহ ও গভীর অনুরাগ
- মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষমতা
- মার্জিত রুচি
- হাসিখুশি অভিব্যক্তি
- সময়ানুবর্তিতা
- স্মার্টনেস
- মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা
- নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা
- শারীরিক ফিটনেস
- প্রতিদিনের ঘটনা সম্পর্কে অল্প বিস্তর ধারণা
- শারীরিক সুস্থতা
- সমৃদ্ধ শব্দকোষ ও বাচনভঙ্গি
- আত্মবিশ্বাস ও শৃঙ্খলাবোধ
- কম্পিউটারে এমএস ওয়ার্ড ও এম এস এক্সেলে কাজ করার ক্ষমতা।

যোগ্যতা ও ইন্টারভিউ

মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ পেশায় ইন্টারভিউ হয় ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ পদ্ধতিতে। অর্থাৎ আপনি সরাসরি গিয়ে ইন্টারভিউ দিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করে চাকরি লাভের সুযোগ। এ পেশায় যোগ্যতা হিসেবে চাওয়া হয় বিজ্ঞানে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। অভিজ্ঞতার কোন প্রয়োজন নেই অর্থাৎ ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটরাই সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে ইন্টারভিউতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়-

- পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে চাওয়া হয় এবং নিজের সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয় এবং নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে বলা হয়।
- এই পেশাতে কেন আসতে চাইছেন তার কারণ ব্যাখ্যা করুন।
- বেসিক জীববিজ্ঞানের, ফার্মাকোলজির জ্ঞান আছে কিনা ও পরীক্ষা করা হয়।
- মোটর সাইকেল চালানো জানা আছে কিনা, সাথে লাইসেন্স আছে কিনা।
- কম্পিউটারের প্রাথমিক জ্ঞান জানা আছে কতটুকু।
- এক্সট্রা ক্যারিকুলাম এক্টিভিটিস আছে কিনা।
- দেশের সব এলাকায় কাজ করতে ইচ্ছুক কিনা।
- ব্যাচেলার ডিগ্রী করার পর প্রার্থী কি করছিল, তা জানতে চাওয়া হতে পারে।
- কতটা সময় প্রার্থী কোম্পানিকে দিতে প্রস্তুত।
- ফার্মাসিটিক্যালস লাইনের কিছু শব্দভাণ্ডার।

এছাড়া আরো অনেক ধরনের প্রশ্ন করা হতে পারে প্রাসঙ্গিকতা অনুসারে। বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর দিতে পারলে সহজে চাকরি আয়ত্তে আনা সম্ভব। ভদ্র ও নম্রভাবে উত্তর করতে হবে, তবে মিনমিন করলে চলবে

সেপ্টেম্বর মাসের বিশেষ বিশেষ দিন

যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংগ্রামের ফলে সৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয় প্রতিরোধ দিবস
প্রতি বছর ৬ নভেম্বর এই দিসবটি পালিত হয়ে আসছে। ২০০১ সালের ৫ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ সভায় এ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। এ দিবস পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যুদ্ধ ও এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিবেশ তথা জীব বৈচিত্র্যের প্রতি মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এসব যুদ্ধের অঘোষিত শিকার হচ্ছে সভ্যতা, শহর এমনকি মানুষের জীবনযাত্রা সব কিছুই। তাই এ মুহূর্তে আমাদের উচিত এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করা।

ফ্যাসিবাদ ও এন্টি-সেমিটিজম বিরোধী আন্তর্জাতিক বিদস
প্রতি বছর ৯ নভেম্বর সারা বিশ্বে এ দিবসটি পালিত হয়। ১৯৩৮ সালে জাতিসংঘ এবং ইউরোপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে ‘ক্রিস্টালনাট’ কর্মসূচির মাধ্যমে ফ্যাসিবাদ ও বর্ণবাদ বিরোধী মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ দিবস পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ‘ক্রিস্টালনাট’ কর্মসূচিকে স্বরণীয় করে রাখা এবং পাশাপাশি ইউরোপের আর কোনো জাতি যেন বৈষম্যমূলক আচরণের শিখার না হয় তা প্রতিষ্ঠা করা এবং যারা এখনও বর্ণবাদী ও ফেসিস্টদের শিকার হচ্ছেন তাদেরকে সহযোগিতা করা।

বিশ্ব সহনশীলতা দিবস
সারা বিশ্বে ১৬ নভেম্বর বিশ্ব সহনশীলতা দিবস পালিত হয়। ১৯৯৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় এ দিবস পালনের ঘোষণা দেয়া হয়। সহনশীলতা মানে হচ্ছে সম্মান প্রদর্শন, গ্রহণযোগ্যতা এবং উপলব্ধি যার মাধ্যমে একটি বৈচিত্র্যময় সমৃদ্ধ জাতির সংস্কৃতি, তার জনগণের মানবিক গুণাবলী প্রকাশ পায়। এ দিবস পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা, অসহনশীলতার ভয়াবহতা সম্পর্কে জানানো এবং পাশাপাশি সহনশীলতা বাড়ানো এবং এ সম্পর্কে শিক্ষা নেয়া।

আফ্রিকা শিল্পোন্নয়ন দিবস
প্রতি বছর ২০ নভেম্বর আফ্রিকা শিল্পোন্নয়ন দিবস পালিত হয়। ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ সভায় আফ্রিকা শিল্পোন্নয়ন দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ দিবস পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আফ্রিকা শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়কে উদ্দীপ্ত করা। এ দিবস পালনের মাধ্যমে আফ্রিকার শিল্পোন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যার মাধ্যমে আফ্রিকার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক হয়।

সার্বজনীন শিশু দিবস
সাধারণত ২০ নভেম্বর সার্বজনীন শিশু দিবস পালিত হয়। জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ১৯৫৪ সালে প্রথম এ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে কিছু দেশ ভিন্ন তারিখে এ দিবস পালন করে থাকে। এ দিবস পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মীতা ও সমঝোতাবোধ জাগ্রত করা এবং পৃথিবীর সকল শিশুর কল্যাণে সচেষ্ট হওয়া।

বিশ্ব টেলিভিশন দিবস
প্রতি বছর ২১ নভেম্বর বিশ্ব টেলিভিশন দিবস পালিত হয়। ১৯৯৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় এ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় কারণ ১৯৯৬ সালেই প্রথম বিশ্ব টেলিভিশন ফোরাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ দিবস পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের টেলিভিশন অনুষ্ঠানাদি আদান-প্রদানে উৎসাহিত করা। বিশেষ করে শান্তি, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক অনুষ্ঠানগুলো পারস্পরিক আদান-প্রদান এবং সংস্কৃতি বিনিময়কে উৎসাহিত করা।

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন বিলোপ দিবস
প্রতি বছর ২৫ নভেম্বর আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন বিলোপ দিবস পালন করা হয়। ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় আমন্ত্রিত সরকার প্রধান, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে এ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেন। এ দিবস পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সকলকে সচেতন করে তোলা।

আন্তর্জাতিক ফিলিস্তিন সংহতি দিবস
সারাবিশ্বের ২৯ নভেম্বর এ দিবস পালিত হয়। ১৯৭৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় এ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ দিবস পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ফিলিস্তিনী জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, পরামর্শ এবং তাদের শান্তিপূর্ণভাবে স্থায়ী বসবাসের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

বিশ্ব দর্শন দিবস
প্রতি বছর নভেম্বরের তৃতীয় বৃহস্পতিবার বিশ্ব দর্শন দিবস পালন করা হয়। ২০০১ সালে ইউনেস্কো প্রথমবারের মতো বিশ্ব দর্শন দিবস পালন করে। এ দিবস পালনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত মানুষের মধ্যে বিদ্যমান দর্শন অন্যদের সাথে বিনিময় করা এবং এর মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন চিন্তার সূচনা করা হয়।

সূত্র: জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা ও ইন্টারনেট

ঝুঁকি পূর্ণ কাজ হতে শিশুকে দূরে রাখুন এবং নিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে সহায়তা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করুন

দরিদ্র জনগণের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় তৈরি ওয়েবসাইট www.jeeon.com.bd দেখুন। সম্পূর্ণ তথ্য 'জীয়ন' শিরোনামে সিডি আকারে পাওয়া যাচ্ছে। সিডি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এমসিসি, ৩/১১ হুমায়ুন রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

D.Net
Development Research Network
www.dnet.org.bd

পল্লীতথ্য বুলেটিন একটি ডি.নেট প্রকাশনা। ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা। আশ্বিন-কার্তিক ১৪১৫ অক্টোবর ২০০৮। ৬/৮ হুমায়ূন রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৮-০২-৮১৫৬৭৭২, ৮৮-০২-৯১৩১৪২৪, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮১৪২০২১, info@pallitathya.org.bd, www.pallitathya.org.bd

পল্লীতথ্য বুলেটিন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পরিচালিত 'অবলম্বন' প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত।